Sanatan Dharma

মাতা বৈষ্ণোদেবী

মাতা বৈষ্ণোদেবী গুহা মন্দির ভারতের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের রিয়াসি জেলার কাটরা থেকে ১২ কিমি দূরে ত্রিকুট পাহাড়ে ৫২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এই মন্দিরটি বিশ্বের অন্যতম পবিত্র স্থান হিসাবে পরিচিত। বৈষ্ণোদেবী মন্দির হল দেবী দুর্গাকে উৎসর্গ করা বিখ্যাত হিন্দু মন্দির। সারা বিশ্ব থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই বিখ্যাত ধর্মীয় স্থানটি পরিদর্শন করে যেখানে মাতা বৈষ্ণোদেবী তাদের ইচ্ছা পূরণ করে। স্থানীয় ও ভক্তদের বিশ্বাস, এখনো পর্যন্ত এই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে এক শক্তিশালী পজিটিভ এনার্জি। প্রতি বছর এক কোটিরও বেশি ভক্ত বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যান দেবীর পূজা দেওয়ার জন্য। মানুষের ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি সবসময় সমাদৃতা। তাই, ভক্তরা তাকে ‘মুহ মাঙ্গি মুরাদিন পুরি করনে ওয়ালি মাতা’ বলেও সম্বোধন করে যার অর্থ যে মা তার সন্তানদের ইচ্ছা পূরণ করেন। ভক্তদের বিশ্বাস দেবী স্বয়ং ভক্তদের এখানে পৌঁছানোর জন্য ডাকেন। তাই, স্থানীয়রা প্রায়শই “মা আপ বুলান্দি” বলেন, যার অর্থ মা ডাকে।
মাতা বৈষ্ণোদেবী গুহায় দেবী সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট শিলা আকারে আছেন যার তিনটি মাথা বা পিন্ডি রয়েছে। দেবী মাতার প্রতীক তিনটি পিন্ডি মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী নামে তিনটি দেবীকে উৎসর্গীকৃত।
ডানদিকের পিন্ডিটি দেবী মহাকালীকে উৎসর্গীকৃত, যা কালো রঙের। কালো রঙ মহাকালীর নামের সাথে যুক্ত এবং তাকে মহাবিশ্বের সমস্ত রহস্যময় এবং অজানা শক্তির একটি মৌলিক উৎস বলে মনে করা হয়। তিনি তার ভক্তদের অন্ধকারের বাহিনীকে জয় করতে সক্ষম করেন। মাঝখানে অবস্থিত দ্বিতীয় পিন্ডিটি দেবী মহালক্ষ্মীর পবিত্র পিন্ডি। এটি পীতাম্বর বা সোনালি হলুদ বর্ণের, যা দেবী লক্ষ্মীর রঙ। তিনি রক্ষণাবেক্ষণের সর্বোচ্চ শক্তি এবং অনুপ্রেরণার পাশাপাশি প্রচেষ্টার গুণে রজো গুণের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাকে সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং বস্তুগত লাভের একটি মৌলিক উৎস বলে মনে করা হয়। তৃতীয় এবং শেষ পিন্ডি, যা বাম দিকে অবস্থিত, মাতা মহা সরস্বতী হিসাবে পূজিত হয়। তিনি সত্ত্ব গুণের প্রতিনিধিত্বকারী সৃষ্টির সর্বোচ্চ শক্তি বলে মনে করা হয়। মহা সরস্বতীর এই পিন্ডি সাদা রঙের। তাকে সৃষ্টি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শিল্প এবং ধার্মিকতার মৌলিক উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মাতা বৈষ্ণোদেবী তীর্থক্ষেত্রে ভক্তরা চুনরি (একটি লাল রঙের চাদর), শাড়ি, শুকনো ফল, রৌপ্য বা সোনার অলঙ্কার, ছোলা, ফুল ইত্যাদি মাতাকে ঐতিহ্যবাহী নৈবেদ্য দেয়। বৈষ্ণোদেবী পূজার কারণেই নয় দিন ধরে নবরাত্রি পালন করা হয় দেশজুড়ে।
হিন্দু ধর্ম মতে আদি শক্তি দেবী মা র অবতার বৈষ্ণোদেবী। অসুরদের অত্যাচারের অবসান ঘটাতে বৈষ্ণোদেবী আবির্ভূত হন। বৈষ্ণোদেবী ধার্মিকতা বজায় রাখার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতা বৈষ্ণোদেবী পরম বৈষ্ণবী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দেবীগণ তাকে পৃথিবীতে বসবাস করতে এবং চেতনার উচ্চ স্তর অর্জনের জন্য তার সময় ব্যয় করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। পৃথিবীতে তার আগমন রত্নাকরের কন্যা হিসেবে। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, বৈষ্ণোদেবী ভারতের অর্ধা কুনওয়ারি, কাটরা শহর এবং গুহার মধ্যবর্তী একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রত্নাকর সাগর এবং তাঁর স্ত্রী বিয়ের পর নিঃসন্তান ছিলেন। দীর্ঘদিন সন্তানের

জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছিলেন তাঁরা। অবশেষে তাঁদের কোলে জন্ম নেয় এক কন্যাসন্তান। এই কন্যাসন্তানের জন্মের পরেই তাঁরা শপথ নিয়েছিলেন যে সন্তানের ভবিষ্যতের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না তাঁরা। বৈষ্ণোদেবীর ছোটবেলা নাম ত্রিকূট ছিল। পরে ভগবান বিষ্ণু বংশে জন্ম নেওয়ায় তাঁর নাম বৈষ্ণো হয়। তিনি ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর প্রবল ভক্ত। মাত্র নয় বছর বয়সে ভগবান বিষ্ণুকে তুষ্ট করার জন্য সে পিতার অনুমতি নিয়ে সমুদ্র ধারে তপস্যা করতে শুরু করেন। বৈষ্ণোদেবী আধ্যাত্মিকপ্রবণ ছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করে বছর কাটিয়েছিলেন। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু অবতার শ্রীরাম রূপে আশীর্বাদও করেন বৈষ্ণোদেবীকে।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল রামায়ণের সময়, যখন লঙ্কার রাক্ষস রাজা রাবণ শ্রীরামের পত্নী সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সীতার খোঁজে আত্মহারা শ্রীরাম। শ্রীরাম যখন সীতার সন্ধানে সমুদ্রে ধারে এসে সে সময় দেখে এক মহিলা তপস্যা করছে। বৈষ্ণোদেবী শ্রীরামকে বিয়ে করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু যেহেতু শ্রীরাম তিনি ইতিমধ্যেই সীতার সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন, তাই শ্রীরাম বিনয়ের সঙ্গে জানান এই অবতারে তিনি কেবল সীতার জন্য নিষ্ঠাবানের জন্য কথা দিয়েছেন। শ্রীরাম তাঁকে কলিযুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে তাঁকে কথা দেন কলিযুগে কল্কি অবতারে তাঁকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করবেন। শ্রীরাম তাঁকে ত্রিকুটা পাহাড়ের গুহায় একটি আশ্রম স্থাপন, ধ্যান ও আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে নির্দেশ দেন এবং সেখানে তাঁর নিরাপত্তার জন্য শ্রীরাম একটি সিংহ, হনুমান ও তীর-ধনুক দেন। এরপর থেকেই শ্রীরামের নির্দেশে বৈষ্ণোদেবী ত্রিকুটাতে একটি গুহার মধ্যে থাকতে শুরু করেন। বৈষ্ণোদেবী সাধবী হিসাবে জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন এবং তপস্যা চালিয়ে যান।

যখন দেবী কাটরার ত্রিকুটা পাহাড়ে থাকতে শুরু করেন, তখন মহাযোগী গুরু গোরক্ষনাথজি, যিনি জানতেন যে বৈষ্ণোদেবী এবং শ্রীরামের মধ্যে কী ঘটেছিল, তিনি তাঁর শিষ্য ভৈরবনাথকে দেখার জন্য করতে পাঠান যে তপস্বী বৈষ্ণোদেবী এখনও আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন কিনা। তাকে দেখে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভৈরবনাথ ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যবোধ হারিয়ে ফেলেন এবং তার প্রেমে পড়েন এবং তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে বিরক্ত করতে শুরু করেন। বৈষ্ণোদেবীকে দেখে ভৈরবনাথ তার প্রতি কামনা করে ধরতে তার পিছনে দৌড়েছিলেন এবং বৈষ্ণোদেবী তার তপস্যা/ধ্যান অবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রিকুটা পাহাড়ের পথে বিভিন্ন স্থানে থেমে পালিয়ে যান। স্থানগুলি এখন বঙ্গগা (তীর থেকে গঙ্গা নদী উদ্ভূত), চরণপাদুকা (পবিত্র পায়ের ছাপ), অর্ধকুনওয়ারী নামে পরিচিত। ভৈরবনাথ যখন বৈষ্ণোদেবীকে ধরতে তার পিছনে দৌড়েছিলেন। বৈষ্ণোদেবী কে রক্ষা করার জন্য পবনপুত্র হনুমান ছিল। হনুমান সঙ্গে ভৈরবনাথের সংঘর্ষ হয় কিন্তু ভৈরবনাথ তার পেছনে যেতে থাকে। বৈষ্ণোদেবী পাহাড়ের একটি গুহার কাছে পৌঁছে ভৈরবনাথকে ফিরে যেতে বলেন কিন্তু ভৈরবনাথ ফিরে যেতে রাজি নয়। তখন বৈষ্ণোদেবী গুহার কাছে হনুমানকে ডেকে বলেন যে, আমি এই গুহায় নয় মাস তপস্যা করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ভৈরবনাথকে গুহায় প্রবেশ করতে দেবেন না। এরপর বৈষ্ণোদেবী গুহায় প্রবেশ করে তিনি ৯ মাস ধরে গুহায় ধ্যান করেছিলেন ঠিক যেভাবে একটি শিশু তার মায়ের গর্ভে ৯ মাস থাকে। হনুমান মায়ের আদেশ পালন করেন। ভৈরবনাথকে এই গুহার বাইরে রাখা হয়েছিল। এই পবিত্র গুহাটিই 'অর্ধ কুনওয়ারি' নামে পরিচিত।

ভৈরবনাথের উন্মত্ততা দেখে অবশেষে ভবনে, যে গুহাটি বৈষ্ণোদেবীর বাড়ি হিসেবে

পরিচিতি সেখানে তিনি দেবী দুর্গার রূপ ধারন করে ত্রিশূল দিয়ে ভৈরবনাথের শরীর থেকে মাথা কেটে আলাদা করে সংহার করে দেন। ভৈরবনাথের দেহ গুহার প্রবেশদ্বারে ছিল, বিশ্বাস করা হয় যে এই গুহাটি ভৈরবনাথের দেহ সংরক্ষণ করে। ত্রিশূল দিয়ে শিরচ্ছেদের কারণে ভৈরবনাথের মাথা পাহাড়ের আরও উপরে একটি জায়গায় পড়ে যেখানে ভৈরবনাথ মন্দির নির্মিত হয়েছে। কথিত আছে, দেবী যখন ভৈরবনাথ বধ করে তখন ভৈরবনাথ তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং অনুতপ্ত হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমার প্রার্থনা করে। শেষে পর্যন্ত, দেবী যখন বৈষ্ণোদেবী রূপে ফিরে আসেন, তখন বৈষ্ণোদেবী তাকে শুধু ক্ষমাই করেননি, তাকে বরও দিয়ে বলেন যে, আমার দর্শন ততক্ষণ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ না তোমার মাথার দর্শন হয় এবং তাকে তার মন্দির রক্ষা করতে বলেন। তাই বিশ্বাস করা হয় যে, ভৈরবনাথের মন্দির দর্শন ছাড়া বৈষ্ণোদেবীর যাত্রা অসম্পূর্ণ। অবশেষে, বৈষ্ণোদেবী তিনটি ছোট শিলা (পিন্ডি) আকারে উদ্ভাসিত হয়ে মাতা বৈষ্ণোদেবী নামে পূজিত হন এবং এখনও পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। আর এই কথাও প্রচলিত আছে যে মাতা বৈষ্ণোদেবী কলি যুগের সময়কে নিজের সন্তানের মতো রক্ষা করছেন।

মহাভারত, যা পাণ্ডবদের এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ দেয়, দেবী বৈষ্ণোদেবীর পূজার উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে যখন পাণ্ডব এবং কৌরবদের সেনাবাহিনী সাজানো হয়েছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন যুদ্ধে বিজয়ের আশীর্বাদের জন্য দেবীর আরাধনা করেছিলেন। তাঁর ভক্তিতে খুশি হয়ে মাতা বৈষ্ণোদেবী রূপে তাঁর সামনে আবির্ভূত হন। যখন দেবী আবির্ভূত হন, তখন অর্জুন একটি স্তোত্র দিয়ে তার প্রশংসা করতে শুরু করেন , যেখানে একটি শ্লোক বলে যায় 'যমবুকতক চিত্যয়ষু নিত্যম সন্নিহিতালয়ে', যার অর্থ 'আপনি যিনি সর্বদা জম্ভুতে পাহাড়ের ঢালে মন্দিরে বাস করেন' – যা সম্ভবত বর্তমান জম্মুকে বোঝায়। কথিত আছে, পাণ্ডবরাই সর্বপ্রথম কোল কান্দোলি এবং ভবনে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন মাতৃদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়। একটি পাহাড়ে, ত্রিকুটা পর্বতের ঠিক সংলগ্ন এবং পবিত্র গুহা উপেক্ষা করে পাঁচটি পাথরের কাঠামো রয়েছে, যা পাঁচটি পাণ্ডবের শিলা প্রতীক বলে মনে করা হয়।

পৌরাণিক কথা অনুসারে আজ থেকে প্রায় নয়শ বছর আগে কাটরার পার্শ্ববর্তী হানসালি গ্রামে পণ্ডিত শ্রীধর ছিলেন আদি শক্তির পরম ভক্ত। মা শক্তি তাঁর অনন্য ভক্তকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন – শ্রীধর। আগামীকাল পূর্ণিমা তিথিতে পাহাড়ের পাদদেশে আশপোশের সব গ্রামের লোকেদের জন্য তোমার গৃহে অন্ন প্রসাদের আয়োজন কর। এত লোকের খাবারের আয়োজন কিভাবে হবে তা ভেবে হতদরিদ্র শ্রীধর ভাবাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তবুও তিনি জগৎ মাতার আদেশে সবাইকে নিমন্ত্রন করে এলেন।

পরেরদিন পূর্ণিমার ঊষা লগ্নে

– কে আছো গো বাড়ীতে ?

ডুরে শাড়ি পড়া পরমা সুন্দরী এক কুমারীকে দেখে শ্রীধর জিজ্ঞাসা করলেন,

– কি নাম তোমার বাছা।

– বৈষ্ণোবী। শুনেছি মা শক্তির আদেশে আপনার বাড়ীতে মহাভোজের আয়োজন হচ্ছে। – ভাবছি এত লোকের খাবারের আয়োজন হবে কিভাবে ?

– কেন অযথা ভাবছেন মায়ের কাজ মা'ই উঠিয়ে নেবেন।

আদিশক্তি দেবী মার স্বপ্নাদেশের পূর্ণতার শরীক হতে আশপাশের সব গ্রামের লোক নিজ নিজ ক্ষেতের চাল, ডাল, আনাজ নিয়ে এসে ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে ডুরে শাড়ি পড়া মেয়েটি কুটিরের একটি ফাঁকা স্থান

দেখে বসল। এদিকে যতটুকু সামগ্রী রয়েছে ততটুকু দিয়েই অতিথি আপ্যায়ণ করতে শুরু করলেন শ্রীধর। মেয়েটিও হাত লাগাল পরিবেশনে। দেখা গেল যে খাবার কম হবে বলে রাতের ঘুম উড়েছিল শ্রীধরের, সেই খাবার কম তো হলই না, বরং বেঁচে গেল। পূর্ণিমার দিন হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ তৃপ্তির মহাপ্রসাদে মেতে রইল।
অনুষ্ঠান শেষে শ্রীধর মেয়েটিকে খুঁজতে শুরু করলেন। কিন্তু কোথায় সেই ছোট মেয়ে ! বিস্মিত শ্রীধর বুঝলেন এ সবই মা শক্তির অলৌকিক কৃপার ফল। তিনি মা শক্তির নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। গভীর ধ্যানের মাঝে তিনি দেখলেন কেউ তাঁকে পথ দেখিয়ে একটা গুহায় নিয়ে গেছে। গুহার মধ্যে তিনটি গোলাকার পাথর যাঁর অর্ধেকটা জলের গভীরে ডোবানো। নিমেষেমাত্র তিনি কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতীর অবয়ব প্রত্যক্ষ করলেন। আদিশক্তির প্রকাশ ত্রিদেবীরূপে সত্বগুণে মহাসরস্বতী, রজোগুণে মহালক্ষী ও তমোগুণে মহাকালী।
কিছুদিন পরে শ্রীধরের স্বপ্নে মেয়েটি ফিরে এল। জানালেন ভক্তের ভক্তি দেখে তিনি তুষ্ট হয়ে মেয়ের রূপে শ্রীধরকে সাহায্য করে গিয়েছিলেন স্বয়ং বৈষ্ণোদেবী। পাশাপাশি জানিয়ে দিলেন কোন গুহার মধ্যে তাঁর মন্দির গড়বেন ভক্ত।
দেবী আদেশানুয়ারী গুহা খুঁজে সেখানে শ্রীধর নির্মাণ করেন বৈষ্ণোদেবী মন্দির। শ্রীধর গুহায় এই মন্দিরে দেবী শক্তির অনুপম তিনটি রূপ কালী, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী তিনটি পিন্ডি মাতা বৈষ্ণোদেবী নামে পূজা করা শুরু করেছিলেন এবং শ্রীধরের বংশধরেরা আজও তা করে চলছেন। জয় মাতা দী।